জন্মদিন

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

আজ সকালের দিনটাই যেন কি রকম।

যা-কিছু করবার ছিল, শেষ হয়ে গিয়েচে রায়বাহাদুরের, প্রথম যৌবনে যখন রাতুলপুর লালমোহন একাডেমির তিনি হেডমাস্টার—মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা মাত্র, তখন সেই রাতুলপুরের স্কুলে পায়া-ভাঙা চেয়ারে বসে সম্মুখস্থ নিবিড় বাঁশবনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কত কি দেখতে পেতেন সিনেমার ছবির মতো। দেখতেন, এ দুঃখ থাকবে না, জীবন আসচে সামনে। সে জীবনে কলকাতায় তাঁর ভিলা হবে বালিগঞ্জে, মোটর থাকবে, কলিংবেল টিপলে উর্দিপরা খানসামা ঘরে ঢুকবে। তখন ছিল স্বপ্ন, স্বপ্ন ছিল অপূর্ব রঙে রঙিন।

আজ তার বয়েস একষট্টি। আজ একষট্টিতে পা দিলেন। লেক প্লেসের বাড়ির, নতুন বাড়ির তেতলায় যে ছোট ঘরটি তাঁর শোবার ঘর, সে ঘরে আজ ভোরে জেগে উঠে দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়তেই রায়বাহাদুর দেখলেন আজ সাতাশে আষাঢ়, তেরশো বাহান্ন সাল। একষট্টি বছরে পড়লেন তিনি আজ।

সকালটা কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন নয়। দিব্যি রোদ উঠেচে বাড়ির ছাদের মাথায়, সোঁদালি গাছগুলোর মগডালে। মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল, চা-পানের পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ছোট মেয়ে সুমিতা বলেছিল—বাবা, টোস্ট ভাজা হচ্চে, দুখানা খেয়ে যাও চায়ের সঙ্গে—

—নাঃ, ও কি মাখন ?আজকাল মাখন বলে যা বিক্রি হয়, ও দিয়ে টোস্ট আমাদের ধাতে সয় না। তোরা খা—

বলে রায়বাহাদুর বেরিয়ে পড়েচেন।

খানিকটা এ-দিক ও-দিক ঘুরে রায়বাহাদুর লেকের ধারের বেঞ্চিতে এসে বসলেন। একখানা মিলিটারি বোট কিছু দুরে ভাসাতে চেষ্টা করচে। একখানা লরি নিকটের রাস্তায় স্টার্ট দেওয়ার প্রচেষ্টায় প্রচুর গ্যাস ও শব্দ ছাড়ছে। নাঃ, কোথাও যদি একটু শান্তি আছে !

একষট্টি হল তা হলে ! যখন তিনি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে, তখন মনে আছে কারো বয়েস বত্রিশ কি চৌত্রিশ বছর শুনলে তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হত। চল্লিশ বছরের লোক তো ছিল বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য। আর এরই মধ্যে তাঁর একষট্টি বছর বয়েস হয়ে গেল ?নিজেকে খুব বেশি বুড়ো বলে মনে করতে পারছেন না রায়বাহাদুর। সেদিনও তো ধর্মতলায় চুলকাটার সেলুনে বসে চুল ছাঁটিয়েছেন—কত দিন আর হবে ! রায়বাহাদুর মনে মনে একটা মোটামুটি হিসেব করবার চেষ্টা করলেন। কাশীথেকে এসেচেন সে-বার। বেশ মনে আছে। লেসলির বাড়িতে তাঁর শালাকে সেবার চাকুরি জুটিয়ে দিলেন গণেশ সরকারের সাহায্যে। গণেশ সরকার তাঁর সহপাঠী, দুজনে একসঙ্গে সে-কালের সিটি কলেজে পড়েছিলেন, গণেশ সরকার লেসলির বাড়ি বড় চাকরি করত—এখন অবসর নিয়েছে। গণেশেরও বয়েস, তা হল ষাট-একষট্টি। দু-এক বছর কম বা দু-এক বছর বেশি। এতে কিছু যায় আসে না।

সেটা হবে ১৯২০সাল, দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর হয়ে গেল—নিতান্ত কমই বা কি ?ভাবলে মনে হয় সেদিনকার কথা। হিসেব করলে দেখা যায়, হাওড়ার পুলের তলা দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে তার পর।

তবে ওই যা ভাবছিলেন রায়বাহাদুর। বয়েস হলে কি হবে, আর পাঁচজন বুড়োর মতো তিনি নন। এমনকি পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের লোককে তিনি অনেক সময় বুড়ো বলে উল্লেখ করে থাকেন। নাতি ও ছেলেমেয়েদের কাছে বলেন—সেই বুড়ো নাপিতটা আজ এসেছিল রে ?নিজের চেয়ে দু-এক বছর কম বয়েসের লোককে বলেন—আরে একেবারে বুড়ো মেরে গেলে যে ! ছ্যা ছ্যা—দাঁতগুলো সব খুইয়েচ দেখচি !

তাঁর দাঁত এখনো অটুট আছে। দাঁতেই নাকি যৌবন, তিনি মনে মনে ভাবেন এবং পাঁচজনকে বলেও বেড়ান। নিজের কাছে এই সত্যটা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে পার্কে নির্জনে বসে চানাচুর ডাল-বাদাম-ভাজা কিনেও খেয়ে থাকেন ?

—এই, কি দিচ্ছিস্ ও ?দুটো ডাল-ভাজা বেশি করে দিস। টাকার ভাঙানি নেই ?ব্যাটারা সব ডাকাত। চার পয়সার ডাল-বাদাম নিলাম, বলে কিনা টাকার ভাঙানি নেই ! এই নে—যা—

বেশ জায়গা করেচে এই লেক। এই বেঞ্চিখানা বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন। নির্জনে বসে থাকতে ও ভাবতে বেশ লাগে। বাড়িতে বড় গোলমাল, বসে ভাববার সময় নেই। ভাববার কথা অনেক কিন্তু বাইরের ঘরে ছেলে ও নাতিদের পড়ার মাস্টার এসে গিয়েচে এতক্ষণ—সুমিতার ঘরে সুমিতার বন্ধু অলকা ও ডাক্তারবাবুর নাতনী বেলা এসে গিয়েছে। অত গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্ কেন ?সুমিতার মাথা বিগড়ে দেবে ওই ডাক্তারবাবুর ধিঙ্গি নাতনীটা। কমিউনিস্ট ! সেদিন কোথা থেকে একটি গাদা ওই সব কমিউনিস্ট বই-পত্তর সুমিতার বিছানায় ! আজকাল কি যে হচ্চে দেশে ! মেয়েছেলেদের মধ্যেও কি না ওই সব !

এই তো গেল বাইরের ঘরের কথা। যদি বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসবেন, তবে অমনি প্রতিবেশী বৃদ্ধ ভুবনবাবু এসে জুটবে।

—এই যে রায়বাহাদুর ! বসে আছেন নাকি ?তামাক খাবেন না সকালবেলা ?আজ কাগজ দেখেননি এখনো—ওকিনাওয়ার ব্যাপারটা দেখেচেন ?ঘোল খাইয়ে ছাড়লে আমাদের বাবাজিদের ! চা ?...তা হয় হোক, আপত্তি নেই।

নয়তো অবিনাশ দালাল এসে বলবে—রায়বাহাদুর, কেমন আছেন ?বেশ, ভালো ভালো। শুনে খুশি হলাম। আর আমাদের এখন—ইয়ে, একটা কথা। হরিশ মুখুজ্যে রোডের বাড়িখানা একবার দেখবেন ?আজই যেতে হয়। ওদের অ্যাটর্নিরা বড্ড প্রেস করচে। কাল আপনাকে ভাবলাম একবার ফোন করি। কটার সময় সুবিধে হবে ?ওর চেয়ে ভালো আর পাবেন না—তবে বায়নার আগে রেজিস্ট্রি আপিসগুলো একবার সার্চ করতে হবে। সে আমি করিয়ে দেব, আপনাকে কিছু করতে হবে না। চা ?এত বেলায়—আচ্ছা, তা—চিনি কম দিয়ে, হ্যাঁ—

কিংবা আসবে গলির জীবন মুখুজ্যে, ওর ভাইপোর একটা চাকরির জন্যে অনুরোধ করতে। তিনি যত বলেন, আজকাল তাঁর হাতে কিছু করবার নেই, চাকরি কোথা থেকে করে দেবেন—ততই তাঁকে আরো চেপে ধরে। বাড়ির ভেতরে যে থাকবেন, সেখানেও বিপদ কম নয়। গৃহিণীর নানা রকম তাগাদা—ভাগনী-জামাইয়ের বাড়ি তত্ত্ব না পাঠালে নয়, ওপরের ঘরের পাখাখানা মেরামত করে দাও—নানা ফইজৎ।

তার চেয়ে এই বেশ আছেন।

পাশের বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ লোক নাক টিপে বসে জপ কিংবা প্রাণায়াম করচে। ওদিকের বেঞ্চিতে একটি যুবক বসে লেকের জলের দিকে চেয়ে রয়েচে। এত সকালে আর কোথাও কোনো লোক নেই।

হ্যাঁ, যা ভাবছিলেন। জীবনটা যেন কি রকম হয়ে গেল। রাতুলপুরের সেই দিনগুলি এই সকালবেলার রোদের মতো স্বপ্নমাখা ছিল। এখন সে স্বপ্নের আবেশও স্মৃতি থেকে টেনে আনতে পারেন না। সেই রাতুলপুরের স্কুলের চটাওঠা দেওয়ালটা। নবীন নাপিত চাকর ঘণ্টা বাজাত। তাঁর জন্যে টিফিনের সময় বাজার থেকে নিমকি রসগোল্লা এনে দিত। নবীনের ছেলেটি মারা গেল টাইফয়েডে, ফ্রি পড়ত স্কুলের নিচের ক্লাসে। তার জন্য একদিন স্কুল বন্ধ হল ! হেডমাস্টার ছিলেন গুরুচরণ সান্যাল। অনেক দিনের প্রবীণ শিক্ষক। তাঁকে বলতেন, আপনি হচ্ছেন ইয়ংম্যান, কেশববাবু, এ সব স্কুলে আপনার পোষাবে না। এ সব কাজ কাদের জানেন, যাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। যেমন ধরুন আমাদের। এ বয়েসে কোথায় যাচ্চি বলুন !

বেরিয়েছিলেন রাতুলপুর স্কুল থেকে তার পরের বছরেই। ভবিষ্যতের সন্ধানে। ভবিষ্যৎ তাঁকে একেবারে প্রতারণা করেনি। অনেকের চেয়ে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেচে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সব দিয়েও ভবিষ্যৎ তাঁকে যেন কিছুই দেয়নি। তাঁর স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েচে, আশাকে কেড়ে নিয়েচে, ফুরিয়ে গিয়েচেন তিনি। নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েচেন। যে ভবিষ্যৎ আজ অতীত, তাতে তিনি জেতেননি—ঠকেচেন।

আজ তাঁর বয়েস—থাক বয়েসের কথা। ওটা সব সময় মনে না করাই ভালো। বয়েসের কথা মনে না আনবার জন্যেই তিনি পার্কে বসা ছেড়ে দিয়েচেন। তাঁর বাড়ির কাছে একটা পার্ক আছে, ছোট পার্কটাতে লেক-

পাড়ার পেনশনপ্রাপ্ত জজ, সবজজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বড় কেরানী প্রভৃতি বৃদ্ধের দল নিয়মিতভাবে বেড়াতে আসে। এ-বেঞ্চিতে ও-বেঞ্চিতে বসবে আর সামাজিক ও শারীরিক কথাবার্তা বলবে। অমুকের নাতনীর বিয়ের কি হল, অমুকের নাতনী এবার ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েচে। মেয়ে ছেড়ে ওরা নাতনীতে নেমেচে। নাতনী সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত হবে, যেন কারো নাতনী কোনোদিন ম্যাট্রিক পাশ করেনি। সব নাতনীই অসাধারণ, সাধারণ নাতনী একটাও চোখে পড়েনি। নাতনীর প্রসঙ্গের পরে উঠবে বাতের প্রসঙ্গ, দাঁতের ব্যথার প্রসঙ্গ, রক্তের চাপের প্রসঙ্গ। যমদূত যেন দণ্ড উঁচিয়ে বসে আছে পার্কটার প্রত্যেক বেঞ্চিখানার ওপরে। সে আবহাওয়ায় বসলেই মনে হয়—

"এবার দিন ফুরুলো

সম্‌ঝে চলো

ইহকাল পরকাল হারিও না—"

কিংবা—"মনে করো শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"

কিংবা "বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে

যাচ্চ তুমি শ্মশানঘাটে—"

ইত্যাদি।...

দিনকতক গিয়ে তাই রায়বাহাদুর আর ওই সব ক্ষুদ্র সামাজিক পার্কে যান না, সেখানে বাত-ব্যাধিগ্রস্ত পেনশনভোগী বৃদ্ধদের যাতায়াত। তার চেয়ে আসেন তিনি এই লেকের ধারে, শ্যাম-বনকুঞ্জ পাও রে ! হরিবর্ণ দ্বীপটি জলের এক দিকে, কত সুগঠিত-দেহ তরুণ, কত প্রণয়চপলা তরুণী কলেজের ছাত্রী আসে যায়। ওয়াকাইয়ের দল কলহাস্যে চটুলপদে বেড়ায় মাঝে মাঝে, ঠোঁটে রঙ, খানিকর আঁটসাঁট পোশাক পরনে। না, এখানে লাগে ভালো। যৌবনের হাওয়া বয় সর্বদা।

তিনি এখনো বাঁচবেন অনেক দিন। হাত দেখিয়ে বেড়ান এখানে সেখানে রায়বাহাদুর, সেদিন কার্জন পার্কে এক উড়িয়া জ্যোতিষী তাঁকে বলেচে। তা ছাড়া এ তিনি জানতেন। তাঁর আয়ু যে প্রায় নব্বইয়ের কান ঘেঁষে যাবে, জ্যোতিষী না বললেও তা তিনি জানেন।

আজ এত পয়সা রোজগার করেও, কলকাতায় এত বড় বাড়ি করেও, ভি-এইট্ ফোর্ড চালিয়েও মনে হচ্ছে রাতুলপুরের সেই দিনগুলো চব্বিশ বছরের সতেজ যৌবন নিয়ে যদি আবার ফিরে আসত...সেই বাঁশবনের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখা...ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাত নবীন নাপিত...কত নির্জনে বসে জীবনের ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা...

তখন ছিলেন গরিব স্কুল-মাস্টার, আজ তিনি বড়লোক। স্কুল-মাস্টারি ছেড়ে এক বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসা ধরলেন, ইনসিওরেন্সের কোম্পানি খুললেন নিজে, বড় আপিস হল, ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হতে লাগল। দেশহিতকর কাজও দু'চারটা যে না করেচেন এমন নয়, পয়সা যথেষ্ট হয়েচে। ছেলেরা বলে—ভালো গাড়ি কিনুন বাবা। একখানা মার্সেডিজ বেন্‌জ দেখে এলাম কাল—খরগোশের মত নিঃশব্দে চলে—কি ফোর্ড গাড়িতে চড়বেন চিরদিন !

যুদ্ধের আগেকার কথা অবিশ্যি। তেলের অভাব ছিল কি ?

কিছু ক্যালকাটা প্রপার্টিজও করলেন, যার জন্যে কলকাতার বড়লোকেরা হাঁ করে থাকে।বাড়ি বিক্রি থাকলেই রায়বাহাদুর কিনবেন। অ্যাটর্নির আপিসে গিয়ে হয়তো জানা গেল বাড়ি থার্ড মর্টগেজ। প্রথম দুই বন্ধকী খতের টাকা শোধ দিয়েও বাড়ি কিনেচেন, জেদের বশবর্তী হয়ে। দিনকতক জমি কেনাবেচা আরম্ভ করলেন। এই লেক অঞ্চলে, বালিগঞ্জ স্টোর রোড, গড়িয়াহাট অঞ্চলের অনেক বাড়ি তাঁর জমির ওপরে। এসব

কাজে ঠকেচেনও অনেক, দায়শূন্য ভেবে যে সম্পত্তিতে হাত দিয়েচেন, রেজিস্ট্রি আপিস অনুসন্ধান করে দেখা গেল তার অবস্থা কাহিল। মানুষকে বিশ্বাস করা যে কত বিপজ্জনক !

আজ সব করেও তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। বড় ছেলে আপিস বেরোয়। ভালো কাজ বোঝে, তাঁর অভাব কেউ অনুভব করে না আপিসে, ঘরেও না। মেয়ে-ছেলেরা এখন মালিক হয়েচে, নিজেরাই ব্যবস্থা করে, তাঁকে জিজ্ঞেসও করে না অনেক সময়। কেবল গিন্নি এখনো পুরোনো দিনের সুর বজায় রেখেচেন, তাঁকে না হুকুম করলে গিন্নির চলে না। মুখনাড়া মুখঝাড়া সব তাঁরই ওপরে। আসলে পুত্রবধূদের প্রতাপে তিনিও প্রায় অর্ধ-বাতিল। সুন্দরী বড় পুত্রবধূটির দাপট সবচেয়ে বেশি, কলেজে-পড়া মেয়ে, মুখের কাছে কেউ এগোতে পারে না, মুখের সৌন্দর্যে ত্রিভুবন জয় করতে পারে। বাড়ির ঝি-চাকর তার কথায় মরে-বাঁচে। বুড়ো-বুড়িকে বড় কেউ একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

তাই তো বলচেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। একষট্টি বছরেই ফুরিয়ে গেলেন।

আজ গাড়ির পঞ্চম চক্রের মতোই তিনি অনাবশ্যক। ওই রাতুলপুরে তিনি প্রথম প্রেমে পড়েন। পুরুতগিরি করতেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, তাঁর মেয়ে, নাম নিরুপমা। শহরের তুলনায়—তাঁর বড় পুত্রবধূ প্রতিমার তুলনায় হয়তো নিরুপমা তত কিছু ছিল না, তবুও সে সুন্দরী ছিল, মুখশ্রী কিন্তু চমৎকার। বাড়িতে আর কেউ থাকত না পুরুতঠাকুরের, নিরুপমার সঙ্গে বুড়ো জলপাইগাছের তলায় দুপুরের ছায়ায় লুকিয়ে দেখা হত মাঝে মাঝে। ষোলো বছরের সুশ্রী কিশোরী।

একদিন নিরুপমা দুটি পাকা আতা দু হাতে নিয়ে এসেছিল।

হেসে বললে—তুমি আতা খাও ?

—কেন খাব না ?

—এই নাও। আমাদের গাছের আতা।

—শুধু আতা দিলে আতা নেব না—

—নিরুপমা চোখ বড় বড় করে বললে—তবে কি ?

—আর কিছু দিতে হবে ঐ সঙ্গে—

—কি ?

—এই দেখিয়ে দিচ্ছি কি—সরে এসো—

—ধ্যেৎ—ভারি দুষ্টু তো !...

হাত ছাড়িয়ে নিরুপমা ছুটে পালিয়ে গেল হরিণীর মতো চটুল গতিতে।...

আর এক দিন।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী সেদিন তাঁর মায়ের তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনে গ্রাম্য মাস্টারটিকেও নিমন্ত্রণ করেচেন। খেতে বসেছেন ভাবী রায়বাহাদুর। পরিবেশন করচে নিরুপমা, আরো পাঁচ-ছজন ব্রাহ্মণ একত্র খেতে বসেচে। হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন নিরুপমা ঘরের মধ্যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। উনি ঈষৎ হেসে ফেলতেই নিরুপমাও মৃদু হেসে জানলা থেকে সরে গেল।

কালকের কথা বলেই মনে হচ্ছে।

অথচ কত কাল হয়ে গেল—চল্লিশ বছর !

আজও চোখ বুজলে নিরুপমার সে সলজ্জ দুষ্টুমির হাসি তিনি দেখতে পান। এক-আধ দিন নয়, এ রকম কত ঘটনা ঘটেছিল এক বছর ধরে। নিরুপমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল। বিবাহ হয়েও যেত কিন্তু

গ্রামের বিধুভূষণ মজুমদার এক সামাজিক জোট পাকালেন। রায়বাহাদুর কিশোরকুণি থাকের ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের রাজারা যে বংশের। তখনকার আমলে কিশোরকুণি থাকের পাত্রকে কুলীনেরা কন্যাদান করতেন না। সেকালে এমনিই ছিল। বিবাহ ভেঙে গেল। রায়বাহাদুর বিদেশী লোক, কেউ তাঁকে খবর দেওয়ার ছিল না। বিবাহের দিন নিরুপমা কেঁদেছিল না কাঁদেনি ?

শুধু সংবাদটা পাবার জন্যে রায়বাহাদুর কত চেষ্টা করেছেন, কেউ এ সংবাদ তাঁকে দিতে পারেনি। আর কখনো নিরুপমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়নি।

কেই বা তাকে সংবাদ এনে দেবে ?

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রায়বাহাদুর সে গ্রাম ত্যাগ করে আসেন। আর যাননি কোনো দিন। জীবনের প্রথম প্রেম, সে সব দিনের কথা ভাবলেও হারানো যৌবন আবার ফিরে আসে যেন।

ওখান থেকে চলে আসার পর তিনি কতবার ভেবেচেন, নিরু আজ কোথায় আছে ?কেমন আছে ?তাঁর জন্য নিরু কি ভেবেছিল ?

এ সংবাদ তাঁকে আর কেউ দেয়নি। বিবাহ করেছিলেন বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু নিরুকে ভোলেননি কোনো দিন। প্রথম প্রথম খুবই ভাবতেন, মধ্যে দশ-বিশ বছর আর তেমন ভাবতেন না, অর্থ উপার্জনের নেশায় ভুলে ছিলেন। এখন আবার মাঝে মাঝে মনে হয়।

একটি তরুণ যুবক এসে কিছু দূরে একটা নারকেল গাছের তলায় দাঁড়াল। এ-দিকে ও-দিকে চেয়ে যেন সে কাউকে খুঁজছে। রায়বাহাদুর সচকিত হয়ে উঠলেন। ছোকরা নিশ্চয়ই ওর প্রেমিকার সন্ধানে এসেচে। তাঁর ছোট ছেলে অমিয়জীবনের বয়সী। আজকাল অমনি হয়েচে যে। তাঁদের সময়ে কিছুই ছিল না। তরুণী অভিসারিকাদের পক্ষে স্বর্ণযুগ চলেচে এটা। কই, ছোকরা একা বসে আছে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে, তিনি কই ?মানে, মা লক্ষ্মীটি ?এখনো আসেন না কেন ?

আজ রায়বাহাদুরের ইচ্ছে হল রাতুলপুরে যাবেন। একবার গিয়ে দেখে আসবেন। তাঁর মনে হচ্ছে, চল্লিশ বছর যেন কেটে যায়নি, যেন তিনি নব্য যুবকই আছেন, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ আছে তাঁর, যেন তিনি ব্লাডপ্রেশারে ভুগচেন না আজ দু বছর, যেন তাঁর বাত হয়নি সেবার আশ্বিন মাসে এবং বাতে কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন না—যেন রাতুলপুরের আম শিমুল জাম কাঁটালের ঘন ছায়ানিকুঞ্জে চিরযৌবনা নিরুপমা আজও কিশোরী, তারই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।

গাছতলার সেই যুবকটি কিছু দূরে একটা বেঞ্চির ওপর হতাশভাবে বসে পড়েচে। বেচারি !

সেই রাত্রেই রায়বাহাদুর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, তিনি রাতুলপুরে যাবেনই। কাল সকালে উঠেই যাবেন। ছোট মেয়ে সুমিতা এসে বললে—বাবা, রাত্রে কি খাবে ?বউদিদি বলে পাঠালেন—

রায়বাহাদুর মুখ খিঁচিয়ে বললেন—কেন, তিনি কি জানেন না আমি রাতে কি খাই, যাও পর্দাটা তুলে দাও—

সুমিতা মুখের অপূর্ব ভঙ্গি করে চলে গেল। রায়বাহাদুরের দোতলায় দক্ষিণমুখী বসবার ঘর। সামনের দেওয়ালে সবই জানালা। সুমিতা জানালার পর্দা খুলে দিয়ে চলে গেল। পুরু গদি-আঁটা গিল্টি কৌচে বসে শেড দেওয়া লম্বা ডালের আলোতে রায়বাহাদুর অন্যমনস্কভাবে একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। এসব পত্রিকা-টত্রিকা এনেচে মেয়ে বা বউমারা, তিনি এসব পড়েন না।

বড় পুত্রবধূ প্রতিমা রূপের হিল্লোল তুলে ঘরে ঢুকে বললে—আমায় ডেকেচেন ?

—হ্যাঁ। আমি কি খাব জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েচ কেন ?আমি কি খাই ?

প্রতিমা জানে শ্বশুর বৃদ্ধ হয়ে ইদানীং খিট্‌খিটে হয়ে পড়েচেন। সে সান্ত্বনার সুরে বললে—না, সে জন্যে না। আপনি দুদিন কিছু খাচ্চেন না রাত্রে, বলেন সাবু করে দাও। তা আজও কি সাবু খাবেন, না লুচি খানকতক গরম গরম করে আনব ?ভালো মাগুর মাছ আছে কি না, তাই বলে পাঠালুম—

—মাগুর মাছের কথা কেউ আমাকে তো বলেনি ! সবাই হয়েচে—

—তা হলে দুখানা লুচিই আনি গে ভেজে ?

—হ্যাঁ, রাত তিনটে কোরো—

—দশ মিনিটের মধ্যে আনচি বাবা।

না, এ সংসারে সুখ নেই। তাঁর মুখের দিকে কেউ তাকায় না।

গিন্নি কি এতই ব্যস্ত যে একবার এসে তাঁর খাওয়ার খোঁজ নিতে পারেন না ?আজ যদি—

প্রতিমা একটু পরেই রুপোর থালায় লুচি সাজিয়ে ও একটা খুরো বসানো ছোট রুপোর বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ঘরে ঢুকল। রায়বাহাদুর বললেন—তোমার শাশুড়ি কি করচেন ?

প্রতিমা সুললিত ভঙ্গিতে আঁচল সামলে নিয়ে বলল—মা ঠাকুরঘর থেকে বেরোননি তো !

—বেশ, বেরুতে হবে না।

—বসুন, জল নিয়ে আসি বাবা, টেবিলেই খাবেন তো ?

রায়বাহাদুর বিরক্তির সঙ্গে বললেন—রেডিওটা সর্বদা ঝং ঝং করলে আমার মাথা ধরে যায়। কে খুলেচে রেডিও ?ছোট বউমা বুঝি ?বন্ধ করে দাও—ও নাকিসুরে গান সর্বদা বরদাস্ত করতে পারি নে—

রাতুলপুরেই যাবেন তিনি। অসহ্য হয়ে উঠেছে এ সংসার। শান্তি বলে জিনিস নেই এখানে। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন প্রথম যৌবনের শত মধুস্মৃতিমাখা গ্রামটিতে। হয়তো নিরুপমার সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে—অন্তত সেই সব জায়গাতেও আবার গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে।

মাথা ধরেচে বেজায়। শুধু ওই রেডিওটার জন্যে। কতবার তিনি বারণ করেচেন—কিন্তু এ বাড়িতে তাঁর কথা কেউ আমলে আনে ?সাধে কি তিনি—শরীর কেমন ঝিম ঝিম করচে।

মধ্য-রাত্রে বড় পুত্রবধূ প্রতিমার ছোট খোকাটি জেগে মায়ের ঘুম ভাঙাল। প্রতিমা উৎকর্ণ হয়ে শুনল দোতলায় শ্বশুরের ঘর থেকে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গোঙানির শব্দ আসচে। সে তখুনি নিচে এসে সকলের ঘুম ভাঙাল। রায়বাহাদুর বিছানায় গুটিসুটি হয়ে অস্বাভাবিকভাবে শুয়ে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার হচ্চে। বড় ছেলে বাড়ি নেই। ছোট ছেলে ফোন করে দিলে ডাক্তারকে। তারপর নিজেও ছুটল। খুব হৈ-চৈ উঠল। সবাই ঝুঁকে পড়ল বিছানার ওপরে, বড় মেয়েকে আনতে মোটর ছুটল বাগবাজারে। ঝি, চাকর, মেয়ের দল, পুত্রবধূর দল, নাতি-নাতনীরা মিলে লোকে লোকারণ্য ঘরের ভেতর। রায়বাহাদুর কি একটা অস্পষ্ট গোঙানির মধ্যে—কেউ বুঝতে পারচে না, প্রতিমা কান পেতে ভালো করে শুনে বললে—নিরু কে ?নিরু কার নাম ?নিরু নিরু করে যেন কি বলচেন !

ডাক্তার এসে বললে, স্ট্রোক হয়েচে। সেবাশুশ্রুষা চলল, বড় ছেলেকে টেলিগ্রাম করা হল রংপুরে। সেখানে সে যুদ্ধের বড় কনট্রাক্টরির কাজে গিয়েচে। ট্রাঙ্ক-কল করা হল মেজ ছেলেকে ঝরিয়ার কয়লার খনিতে।

সেদিন বেলা বারোটার আগে রায়বাহাদুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।